অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল-ভুজঙ্গ

নিশি ফিসফিস করে ডাকল, সোনামণি, অ সোনামণি।

সোনামণি কোনো উত্তর করল না। মানুষটা বারান্দায় বসে সোনামণিকে ডাকছে। সোনামণি উঠনে কচু সেদ্ধ করছে। দু'মেয়ে সোনামণির। অঙ্গি বঙ্গি দুই ছানাপোনা উনুনের ধারে কচু সেদ্ধ হবার আশায় বসে রয়েছে। উদোম গায়ে বসে। আছে। আর অভাব সোনামণির নিত্যদিনের। সারা অঞ্চল জুড়ে খরা আর খরা। বর্ষা নেই। বৃষ্টি হচ্ছে না। বৃষ্টির আশায় মানুষটা বারান্দায় বসে আকাশ দেখছিল। বর্ষা এলেই ফসল ফলবে। ঝোপে-জঙ্গলে শাকপাতা গজাবে। অন্ন নেই পেটে, মানুষের অন্ন না থাকলে মাথা ঠিক থাকে না। সুতরাং নিশির ডাকে সোনামণি বিরক্ত হচ্ছিল।

'কিছু বুলছিলম রে সোনামণি', খর গলায় ফের ডেকে উঠল নিশি।

তবু সোনামণি জবাব দিল না। মানুষটা খাবার লোভে অমন করছে।

আমি কি তুর কেউ না রে সোনামণি? এবার সোনামণি খেপে গেল। তু আমার ভাতার নিশি। রাগলে সোনামণির কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। মরদকে ভাতার, আসলে ভাতার অথবা

গালাগাল-মরে না কেন, যম কি নেই, হা ঈশ্বর, তুর মুখে আগুন—এ সব বলে সোনামণি কেমন সুখ পায়। সুখ পায়। সুখ পেলে তখন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কটুবাক্য বর্ষণ। বারান্দা থেকে অল্প জ্যোৎস্নায় নিশি টের পেল—সোনামণি এবার হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কটুবাক্য বর্ষণ করবে। ভয়ে নিশির গলা প্রায় কাঠ হয়ে গেল। সে ভয়ে ভয়ে বলল, রাগ করিস না সোনামণি। তুকে একটা কথা বুললে রাগ করে লিবি না তো!

'মরণ'—সোনামণি মুখের ওপর ঝামটা মারল একটা। মাঠে এখন আগুন জ্বলছে, পেটে আগুন—মানুষটার চোখে আগুন। সোনামণি এই প্রখর খরার দিনে নিশির চোখে আসঙ্গলিপ্সা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

মরণ বুলছিস সোনামণি। মরণ বুলতে লাই রে। মরণ বুললে স্বামীর ঘরে আগুন লাগে। ঢোল বাজায় যে মানুষ, যে মানুষ বাড়ি বাড়ি পূজা-পার্বণে ঢোল বাজায়, কাঁসি বাজায় তারে মরণ বুলতে নাই। তারপর বারান্দা থেকে সন্তর্পণে নেমে খোলা মাঠের দিকে মুখ করে বলল, তুই সোনামণি নিশির সঙ্গে মাঠে যাবি। বড়ো মাঠ। মাঠের দক্ষিণ সামুতে সরকারি খামার। খামারে বাবুরা বীজের ধান্য বুনেছে। সোনামণি রে সোনামণি, কী ধান্য, কী ধান্য! বলে নিশি একটা ঢোঁক গিলল। নিশি, যে ঢোল বাজায় পূজা-পার্বণে, যে কাঁসি বাজায় পূজা-পার্বণে, মুচিরাম হিদে যার বাপ ছিল, পাঁচ কাঠার জমির ওপরে যার ঘর ছিল, যার এখন কিছুই নেই—সব বন্ধক নিয়েছে ভালোমানুষের ছা শশী। শশী এখন বাবু, বাবু শশী খামারে এখন দারোয়ানের কাজ করছে।

সোনামণি বলত–নাগর আমার!

সেই নাগরের বিয়েতে, কন্যার অন্নপ্রাশনে ঢোল বাজিয়েছে নিশি। পাপ মুছে পুণ্য তুলে দিয়ে এসেছে, আর ধান্যদূর্বা ঢোলের উপরে-নিশি কত মঙ্গলকামনা করেছে শশীর। সেই শশীবাবু দু-গণ্ডা টাকায় জমি বন্ধক রেখে সোনামণি সহ নিশিকে বিবাগী করে দিল।

নিশির দুই মেয়ে, অঙ্গি বঙ্গি। ওরাও পূজা-পার্বণে নিশি ঢোল বাজাতে গেলে ছোটো গামছা পরে সঙ্গে সঙ্গে যায়। বাপের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি কাঁসি বাজায়। কিন্তু, খরা প্রবল খরা। এখন আর কে কার পাপ মুছে পুণ্য নেয়। তাই অঙ্গি বঙ্গি, দুই মেরে কচু সেদ্ধ পাতে তুলে খুব তারিয়ে খাচ্ছে।

বোধহয় দুই মেয়ের তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া দেখেই নিশি আগুন হয়ে উঠেছিল। পেটে আগুন, পিঠে আগুন, সারা মাঠময় শুধু আগুন ছড়িয়ে আছে— ক্ষুধার আগুন। নিশি ক্রমশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল—'অ সোনামণি, শুনতে পেছিস।

দুই মেয়ের খাওয়া দেখে সহ্য হচ্ছে না মানুষটার। সোনামণিও আগুন হয়ে আছে ভিতরে ভিতরে। সে দাঁত শক্ত করে বলল, শুনতে পেছিস নাগর।

সব শুনতে পেয়েছে, তবে সে এবার গলে গলে পড়ল। অরে সোনামণি, অ সুমি, তবে দে, দুটা খেয়ে লিলে শান্তি পাই।

‘হা আমার মানুষ রে! বলে সোনামণি কপালে করাঘাত করল। প্রায় বিলাপের মতো সুর ধরে বলতে থাকল, হায় ছানাপোনা পাখ-পাখালির হয়, গাছের পাতা মাছের মাথা হেথা-হোথা যা মিলে লিয়ে আসে, ছানা-পোনার কষ্টে পাখ-পাখালির ঘুম থাকে না চোখে—আর তু এক মনুষ্যের ছানা, মেরে দু’টা খেয়ে লিচ্ছে তর সহ্য হচ্ছে না!

অরে সোনামণি, অরে সুমি, তুই এমন করে রেতের বেলা বিলাপ করিস না। বিলাপ করলে মাঠে-ময়দানে মড়ক লেখেছে ভেবে সকলে ছুটে আসবে। আমি এক মানুষ, ঢুলি মানুষ, আমার দুই মেয়ে অঙ্গি বঙ্গি, ঢুলি মানুষের অমঙ্গল বইতে নাই। নিশির ইচ্ছা হল, ঘরে ঢুকে ক্ষিধের জ্বালায় ঢোলটা কাঁধে নিয়ে মাঠে নেমে যায়। মেয়ে দুটো কচু সেদ্ধ খাচ্ছে। সোনামণি কাঠের হাতা নিয়ে বসে রয়েছে, ওরা পাতেরটুকু শেষ করে ফেললেই বাকিটুকু ঢেলে দেবে। নিশির ঢোল নিয়ে ছুটতে ইচ্ছা হল মাঠে, তারপর ঢোলের উপর বোল তুলে, ছররা ছুটিয়ে, মাঠে ময়দানে আগুন ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হল। ক্ষুধার আতঙ্কে সোনামণির গলা টিপে ধরতে ইচ্ছা হল।

বড়ো দুঃসময়। না আছে পূজা, না আছে পার্বণ। দেশের লোক আকালে আকালে গেল। কী করবে, কাকে দোষ দেবে, সে ভেবে পেল না। তা ছাড়া মনে হল, রেগে গিয়ে লাভ নেই। বরং ঠান্ডা মাথায় পেটে হাত রেখে বসা যাক। উঠনের ওপর চুপচাপ বসে থাকলে

সোনামণির দয়া হতে পারে। সে সোনামণিকে সেজন্য আর বিরক্ত করল না। উঠনের উপর সে হাঁটু গেড়ে বসে থাকল। মনে হল শশীর কথা। শশীর জমির কথা। সরকারি খামারে বীজের জন্য ধান ছড়িয়ে রেখেছে শশী। ধানের কথা মনে পড়তেই নিশির সবটুকু জ্বালা মুহূর্তে উবে গেল। সে এবার গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াল সোনামণির কাছে। দে, একটু দে। পেটের জ্বালা নিবারণ করি। দে, দোহাই তুর বাপের সোনামণি, দে একটু দে, পেটের জ্বালা নিবারণ করি। দিলে তুর আয়ু বাড়বে সোনামণি। পুণ্য হবে তুর। সতীলক্ষ্মী হয়ে মরবি। তারপর খুব কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, যাবি তু, যদি যাস তবে সোনার ধান্য তুলে লিব। শশী কাদামাটিতে বীজের ধান্য ছড়িয়েছে। যাবি তু! তু আর আমি দু-পাখিতে সারা রাত ঠুকরে ঠুকরে ধান্য তুলে লেব। সোনামণিকে বড় তাজা মনে হচ্ছে এখন। স্বপ্নে দেখছে যেন। নিশি এবার সুযোগ বুঝে বলে ফেলল, দে সোনামণি, দে একটু খাই। খেয়ে পেটের জ্বালা নিবারণ করি। সঙ্গে সঙ্গে সোনামণি কেমন রেগে গেল। শক্ত হয়ে বসে থাকল। সারা দিনমানে এই কচু সেদ্ধ সম্বল। সে নিশিকে আড়াল দেবার জন্য হাঁড়িটা পেছনের দিকে টেনে নিল।

বড়ো দুঃসময়। বড়ো বেহায়া নিশি। সে ঘুরে গিয়ে সামনে বসল। তারপর সেই আগের মতো হাত বিছিয়ে বলল, আমি ঢুলি মানুষ সোনামণি, আমারে তু ছোটো করে লিচ্ছিস। তু আর আমাতে এত ভালোবাসা, তু আমারে ছোটো করলে ধম্মে সইবে না।

তখন অঙ্গি ডাকল, বাপ। বঙ্গি ডাকল, বাপ।

তখন সোনামণি টিনের ভাঙা থালায় অবশিষ্ট কচু সেদ্ধ দু-ভাগ করে নিশির পাশে খেতে বসে গলে। ‘লে খা। ইবারে কী বুলবি বুল।

সোনার ধান্য আছে গ মাঠে। নিশি কচু সেদ্ধ মুখে আলগা করে দেবার সময় কথাটা বলল। এমন করে বলল, যেন স্বপ্নে দেখা গুপ্তধনের খবর দিচ্ছে।

কোথায়?

‘শশীর খামারে। নিশি দুলে দুলে এত বড়ো খবরটা ভালো করে এবার শোনাল সোনামণিকে।

অঙ্গি বলল, আমি যাব বাপ!

বঙ্গি বলল, আমি যাব বাপ।

দেখলি ত!

সোনামণি ঢকঢক করে জল খেল। তারপর এনামেলের তোবড়ানো ঘটিটা পাশে রেখে বলল, গেলে কী অধম্মটা হবে শুনি।

ধরা পড়ে যাব।

চুপি চুপি যাব। কেউ টেরটি পাবে না। ওরা খুঁটে খুঁটে ধান তুলে নিবে।

অঙ্গি বঙ্গি দুই মেয়ে। সুদিনে দুর্দিনে এই দুই মেয়ে। সুদিনে ফসল কাটা হলে মেয়ে দুটো মাঠময় ঘুরে বেড়ায়। কোন মাঠের কোন সামুতে ইঁদুরে গর্ত করে ধান চুরি করে নিয়েছে তার খবর বয়ে আনে ঘরে। তখন নিশি আর ঢোল কাঁধে লয় না। মাথায় ফেটি কাঁধে কোদাল। নিশুতি রাতে দুই মেয়ে সঙ্গ দেয়। সরু হাতে অঙ্গি বঙ্গি দুই মেয়ে গর্তের ভেতর থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ ধান তুলে আনে অথবা ওরা পাহারা দেয়। মাঠময় চোখ সজাগ করে রাখে-বাপ কে যেন আসে! সাপ, ওটা কী? বাপ কোদালে যেন কী লেগে আছে—অক্ত লেগে আছে। অক্ত বাপ, কীসের অক্ত হঁদুরের! তখন হেই হেই করে নিশির চিৎকার, না রে না, ইঁদুর-বাদুড় কিছু নয়, মা বসুন্ধরার কন্যা মামনসার বাহন ভুজঙ্গ। কালো রঙের ভূজঙ্গ চিকচিক করছে, আর মাথাটা দোলাচ্ছে। কিন্তু সেবারে কী হল বাপ। কোদাল মেরে মেরে হয়রান নিশি, মাটির তলায় কোন সুদূরে ইঁদুরে ধান টেনে নামিয়েছে টেরটি পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও ধানের গুচ্ছ নেই একটা। হায় হায়, পরিশ্রম বৃথাই গেল। রাগে দুঃখে গান ভেসে এল নিশির গলায়, সময়ে ওটা সুখের গান ছিল—হায় মা, কে কার তবে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী। কিন্তু নেই, ধান গর্তের ভিতর কোথাও নেই—প্রায় মাঠ চষে ফেলেছে নিশি, নিশুতি রাতে অঙ্গি বঙ্গির ভয় ধরে গিয়েছিল, তখন নিশির নজর হক করে থেমে গেল। গর্তের মুখে আলিসান ভুজঙ্গ। কালো রঙের ভুজঙ্গ। কোদাল মারলে সামান্য লেজটুকু কাটা যাবে। গোটা শরীর গর্তের ভিতরে। হায় তবে সব যাবে।

ভিতরে সোনার ধান্য আছে গ মা জননী। তবে ইবারে কী করি। বলে এক হ্যাঁচকা টান লেজ ধরে। হাত বিশেক দূরে আলিসান ভুজঙ্গটা উঁইয়ে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর যায় কোথায়। নিশি দেখল, ভুজঙ্গটা ওকে তেড়ে আসছে। ঠিক মনে হল সোনামণির মতো তেড়ে আসছে। নাকে নথ ছিল সোনামণির, বালির চরে সোনামণি হক করে কাকে কামড়ে দিয়েছিল—বুঝি শশীকে, বুঝি নিশিকে এখন কামড়ায়, নিশি ছুটতে থাকল, ঘুরতে থাকল। নিশি এঁকেবেঁকে চলতে থাকল। আর হাঁকতে থাকল—অঙ্গি বঙ্গি ধান তুলে লে। আমি ভুজঙ্গরে ডাঙায় তুলে আড়াল করে লিচ্ছি। নিশি আলের ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ছুটতে থাকল।

অঙ্গি বঙ্গি নাছোড়বান্দা। ওরা যাবেই। মৃগয়াতে বাপ বাবে, সঙ্গে মা সোনামণি যাবে—ওরা যাবে না কেমন করে হয়।

সুতরাং অঙ্গি গেলে, বঙ্গি গেল। সঙ্গে মা সোনামণি এক কাপড়ে মাঠে নেমে গেল। কিছু আর সম্বল নেই সোনামণির। এক কাপড়ে, এক আঁচলে ওকে সব সংগ্রহ করে আনতে হয়। নিশি কাঁধে গামছা ফেলে, কোমরে নেংটি এঁটে সকলের আগে আগে চলল। আর গান ধরল, সুখের গান। কে কার তরে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী।

গহন মাঠ। দূরে লণ্ঠন নিয়ে শশী খামারে উঠে যাচ্ছে। সে মাঠের ভিতর একটা ভাঙা টিন বেঁধে রেখেছে। টিনটা থেকে থেকে বেজে উঠেছিল। একটা দড়ি, লম্বা দড়ি মাথার উপর দিয়ে টিনটা বাজায়। নদী থেকে, বিল থেকে পাখ-পাখালি উড়ে আসার সম্ভাবনা।

বীজধান বুনে শশীর চোখে ঘুম নেই। যখন দেশে আকাল, যখন দেশে শস্য মিলছে না—হঁদুরে-বাদুড়ে শস্য খেয়ে নিতে কতক্ষণ। শশী খামারে বসে এখন শুধু টিন বাজাবে। নিযুতি রাতে শব্দটা বড়ো ভূতুড়ে মনে হয়—মনে হয়, কেউ যেন মাঠময় আকালের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। পাখপাখালিরা আকালের ভয়ে আর নদী বিল থেকে উঠতে সাহস পায় না।

ওরা তখন তারকাঁটার বেড়াটা পার হচ্ছিল। ঠিক তখনই টিনটা বেজে উঠল। ঝরঝর করে বেজে উঠল। মাথার ওপর দড়িটা অনেক দূরে টেলিগ্রাফের তারের মতো চলে গেছে। শশী খামারে বসে দড়ি টানছে। নিশি পায়ের ওপর ভর করে দেখাল—'ওই যে হোথা, উঁইয়ে সোনার ধান্য।

অঙ্গি বলল, কোথা রে বাপ?

বঙ্গি বলল, কুনঠিতে?

নিশি বলল, হুই যে, দেখতে পেছিস না!

ওরা পা টিপে টিপে হাঁটছিল। শশীর দড়ি ওদের মাথার ওপর। বীজধানের জমিতে বাঁশের খুঁটি। খুঁটির মাথায় ভাঙা টিনটা ঝুলছে। জ্যোৎস্না ছিল সামান্য। কোথাও একটা পাখি ডেকে ডেকে তেপান্তরে হারিয়ে যাচ্ছে। সোনামণির বড় ভয় করছিল। শশীর ভয়। দড়ি ধরে শশী বসে আছে। ভয়ে সোনামণির বুকটা শুকিয়ে উঠছে। নিশি ফিসফিস করে

ডাকল, কোনো কথা লয় সোনামণি। কথা বললে শশী টের পাবে। ধরা পড়লে জেল হাজতবাস। গেরস্থের ঘরে চুরি লয়, সরকারি ধান্য, বীজধান্য, ধান্য থেকে হেথা হোথা সব পুণ্য উঠবে।

অঙ্গি ডাকল—বাপ।

বঙ্গি ডাকল, বাপ।

আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজনই আলের ওপর উপুড় হয়ে গেল। টিনটা ঝরঝর করে বাজছে। আকালের ঘণ্টা বাজাচ্ছে শশী। ঘণ্টাটা ক্রমাগত বেজে চলেছে। শশী কি টের পেল-পাখ-পাখালি উড়ে এসে বসেছে। আকালের ঘণ্টাও পরানে ডর ধরাচ্ছে না! যেন শশী শরীরে সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে দড়ি টানছিল। যেন প্রাণপণ ঘণ্টাধবনি করছিল। ভয়ংকর শব্দটা গ্রাম মাঠ পার হয়ে বিলের দিকে নেমে যাচ্ছে। তখন কে যেন কেবল বলছিল, হুই হোথা নিশি রে, সোনার ধান্য পড়ে আছে রে! ওরা হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিল। শুধু একটু যেতে পারলেই হয়। ওরা প্রাণপণ হামাগুড়ি দিতে থাকল, গোসাপের মতো ওরা এগোচ্ছিল। শুকনো জমি, উত্তাপে সব ঘাস জ্বলে পুড়ে গেছে। ওদের হাঁটু থেকে, কনুই থেকে রক্ত ঝরছিল। ওদের হুশ ছিল না, ওরা বীজ ধানের জমি নাগাল পাবার জন্য অধীর এবং জীবনের সুঁই নাগাল পেয়ে নিশি আনন্দে প্রায় কিছুক্ষণ জমিতে হাত রেখে মড়ার মতো পড়ে থাকল।

সোনামণি ডেকে উঠল, মানুষটা কতকাল অন্নের মুখ দেখেনি, কতকাল ওরা অন্নভোজন করেনি, সোনামণি ভয়ে ডেকে উঠল, হেই। মাথার চুল ধরে টানল। হেই, কী হয়েছে তুর! সোনামণির ভয়, নিশি দুবলা নিশি এত দূর আসতে গিয়ে ফুসফুসটা জখম করে ফেলেছে। ফুস করে হাওয়া বের হয়ে গেলে আর কী থাকল।

নিশি। অঃ নিশি। সোনামণি ফের ডেকে উঠল।

নিশি এবার চোখ মেলে তাকাল এবং খপ করে হাতটা ধরে ফেলল সোনামণির। তারপর ভুইয়ের ভিতর, কাদা জমির ভিতর নেমে গেল। ওরা প্রায় চারটা পাখির মতো খুঁটে খুঁটে যেন ধান খেতে থাকল। খুঁটে খুঁটে খুব সন্তর্পণে–আলগোছে হাত বাড়িয়ে তুলে আনল ধান। একটা ধান, দুটো ধান, একসঙ্গে পাঁচটা সাতটা ধান তুলতে পারছে না। পাঁচটা সাতটা ধান তুলতে গেলে এক মুঠো কাদা উঠে আসছে। জ্যোৎস্না প্রায় মরে আসছিল। ওরা ধানের চেয়ে কাদা তুলে ফেলছিল বেশি। শশী খামারে বসে দড়ি টানছে তো টানছেই। এক মুহূর্তের জন্য থামছে না। থামলেই ওরা চারটা পাখি ভুইয়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। হাতে পায়ে কাদা, শরীরে কাদা-সর্ব অঙ্গে কাদা লেগে আছে। চোখ মুখ দেখলে এখন কে নিশি কে সোনামণি, আর কে অঙ্গি বঙ্গি বোঝা দায়।

ঠিক পাখির মতো ওরা এক পা দু-পা করে এগুচ্ছিল। কাদার ভিতর হামাগুড়ি দিচ্ছিল। ধান খুঁটে যে যার গামছায় রাখছে। সোনামণি ধান তুলে আঁচলে রাখছে। ধানের সঙ্গে কাদা আর জমি থেকে জল শুযে আঁচলটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। ধান সামান্য, কাদা

জলে গামছা ভরে গেল নিশির। সে কী করবে ভেবে পেল না। ধীরে ধীরে সোনামণির কাছে বুদ্ধির জন্য উঠে গেল। কাছে গিয়ে দেখল সোনামণি গোসাপের মতো কাদা হাটকাচ্ছে। শরীরে কোনো বাস রাখেনি। সোনামণি অঙ্গ ছোলা মুরগির মতো। গোটা শরীরটা ভুইয়ে বিছিয়ে রেখেছে। সে তাড়াতাড়ি ধান তুলে নিচ্ছে। কারণ শশীকে বড়ো ভয় সোনামণির। শশী বড়ো চেনা মানুষ কঠিন মানুষ। মনে হতেই দাঁত শক্ত হয়ে গেল সোনামণির। কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে কটুবাক্য বর্ষণ করতে ইচ্ছা হল। বেইমান শশী, নেমকহারাম শশী। লজ্জা শরম মানুষটার দিন দিন উবে যাচ্ছে। পয়সা হাতে আসতেই শশী তবলা ডুগি কিনে বোলানের একট দল করে ফেলল। ওস্তাদ শশী সোনামণিকে তাড়ি খাবার লোভ দেখাল। সোনামণির সোনার ধান্য চুরির লোভে নিশি বাড়ি না থাকলে শশীর ঘুরঘুর করা বেড়ে যেত। শশী—তুমি গোলাম হে শশী। সোনামণির চোখে আগুন জ্বলছিল, জিভ ভয়ে শুকিয়ে আসছিল, আর সেই এক সিংহের খেলা দেখানো চোখ সোনামণির। সামান্য দূরে অঙ্গি বঙ্গি। সেচের জল বীজের ধান, সেই ধান তুলে এদিকেই এগিয়ে আসছে অঙ্গি বঙ্গি। আর সেই মানুষ নিশি, কুঁড়ে মানুষ বসে বসে সোনামণির তামাশা দেখছে। সোনামণি খ্যাঁক করে উঠল।

নিশি আমতা আমতা করে বলল, গামছাটা ভরে গেল সোনামণি। ধান লেবটা কীসে।

হা রে আমার মরদ। সোনামণি ফের দুঃখে দাঁত শক্ত করে ফেলল। এখন বচসার সময় না। নাচন-কোদনের সময় নয়। এখন শুধু ধান তুলে নেবার সময় নিশিকে বসে থাকতে দেখে আগুনের মতো ওর শরীর জ্বলে উঠছিল। সে কী ভাবল, কী দেখল নিশির,

তারপর সহসা নিশির নেংটিটা হ্যাঁচকা টানে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ঠিক যেন এক ভুজঙ্গ এখন ভূঁইয়ের মাঝে পড়ে আছে চিত হয়ে।

নিশি বলল, হ্যা ল সোনামণি, হ্যা ল সুমি, আমি নিশি, আমি ঢোল বাজাই পুজা-পার্বণে, আমারে তুই উলঙ্গ করে দিলি!

মরদের কথা শুন! সোনামণি ধান রেখে শাড়িতে মুখ তুলে কথা বলল। 'আমার সাধু রে। সুমি ফের সাঁতার দিল কাদার ভিতর। কিছু জানে না মরদ। খুঁটে খুঁটে কিছু ধান তুলে আনল। 'অঃ আমার গাজনে সন্ন্যাস লিয়েছে রে, জয় মহাদেবের বাচ্চা রে! যা যা ওটা বিছিয়ে যা পারিস তুলে লেগা। সোনামণি আর তাকাল না নিশির দিকে। মাথার উপর এখন আর দড়িটা নড়ছে না। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। শশী তুমি বড়ো চতুর হে! তুমি নিশিকে টাকা দিয়ে বশ করেছ। আর তখন চারিদিকে খরা, আগুনের মতো ঝিল্লি মাঠময়, গোরু বাছুর জলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। আর শশী তুমি বড়ো চতুর হে। তাড়ির খোঁজে তুমি শশী বনবাদাড়ে ঘুরঘুর করছিলে।

নিশি সেদিন বাড়ি ছিল না। অঙ্গি বঙ্গি নিশির সঙ্গে ঢোল বাজাতে চলে গিয়েছিল দূর গাঁয়ে। তখন সোনামণি, একা সোনামণি বন-বাদাড়ে, ঝোপে-জঙ্গলে কচু কদু খুঁজে মরছে। তখন হনুমানটা গাছ থেকে লাফ দিয়ে একেবারে সামনে নেমে ভূতের মতো পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকল। আর যায় কোথায় সোনামণি। সে ঝোপের ভেতর থেকে বলল, অঃ ভালোমানুষের ছা, দেখ তো গাছে ওটা কী? আর যখন লোকটা গাছ দেখতে গিয়ে

বলল, কই কোথাও তো কিছু দেখতে পেছি রে, সোনামণি, কই রে, কী দেখালি তুই, কী দেখাবি তুই আমারে...' তখন সোনামণি তাড়াতাড়ি ঝোপ থেকে বের হবার ফাঁক খুজছে। বের হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সব লতাপাতার ঝোপ। কোনোরকমে লতাপাতা গা থেকে সরিয়ে মাঠে নেমে যাবার চেষ্টা করছে। এবং বলছে, দ্যাখ দ্যাখ গাছের মাথায় পাখি, পাখিটা ডিম পাড়ছে দ্যাখ। কিন্তু হায়, মানুষটা গাছ দেখছে না, সে সোনামণিকে দেখছে-'আমি বলি ঝোপের ভিতর কী খচখচ করে, দেখি নিশির বউ সোনামণি। বলে মুখটা ঝোপের কাছে নিয়ে হা হা করে হেসে উঠল। কথা শুনে সোনামণি বলল, অত হাস্য ভালো লয় শশী। কেমন শুকনো গলায় কথাটা বলল এবং ঝোপের ভিতর একটা পাখি হয়ে বসে থাকল। চিৎকার করতে পারল না। কেউ কোথাও নেই। এই ভর দুপুরে এত বড়ো মাঠে খরা বলে কেউ নেই। আগুন জ্বলছে মাঠে, শশীর সুদের কথা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে শশী সেই যেন এক আলিসান ভুজঙ্গ হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকতে চাইছে। সোনামণি বলল, অ মা গ! বলে ফুড়ত করে মাঠের ভিতর উড়ে যেতেই খপ করে আলিসান ভুজঙ্গটা ওর একটা পা কামড়ে ধরল যেন। 'পাখি গাছে ডিম পাড়ে, বড়ো বড়ো ডিম, মুরগির মতো ডিম। তারপর সোনামণির শরীরের ভিতর কোথাও না কোথাও ডিম আছে, মুরগির ডিম লুকানো আছে, সোনামণি শরীরে মুরগির ডিম লুকিয়ে রেখেছে—আর যায় কোথায়, শশী ডিমের জন্য, ডিম বের করার লালসায় ওকে তছনছ করে দিতে গিয়ে দেখল, সোনামণি ওর হাতে কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

সোনামণির চোখ দুটো কাল-ভুজঙ্গের মতো ফোঁস ফোঁস করছিল তখন। সোনামণির কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। কচু কদু ফেলে সোনামণি একসময় ছুটতে থাকল।

নিশি এখনও পাশে বসে রসেছে। ওকে সোনামণি টান মেরে উলঙ্গ করে দিল। সে রাগে দুঃখে প্রায় কথা বলতে পারছিল না। সোনামণিকে বড়ো ভয় তার। তবু কাতর গলায় বলল, আমি ঢোল বাজাই, পাপ ফেলে পুণ্য আনি, তু আমারে সোনামণি উলঙ্গ করে দিলি।

সোনামণি ধান দেখে রসে বশে আছে। ওর সব দুঃখ কষ্ট এই ধান, এত ধান হরণ করে নিয়েছে। সে উল্লাসে প্রায় নীচু গলায় গান ধরে ছিল, হায় মা, কে কার তরে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী। তারপর বলল, কত সোনার চান্দে পরান কান্দে...অ নিশি তু আমারে মেরে ফেল রে।

কীসে কী কথা হয়, নিশি বোঝে না। সোনামণি এখন প্রায় পাগলের মতো হাসছে। কথা বলছে। কথা তো নয়, যেন সুর ধরে চড়ক পূজার দিনে মেলার শুনি মাসির মতো কণ্ঠ খুলে দিয়েছে। বিরক্ত হয়ে নিশি বলল, তর পরান এত উথাল পাথাল করে কেন রে সোনামণি?

তখনই খামারবাড়িতে কার গলা যেন হেঁকে উঠল, ও সামুতে কার গলা পাই হে। এত রাতে কার গলা পাই হে।

সোনামণি গলা চিনতে পেরে বলল, হেই হেই নিশি, কী বুলছে শুনে লিচ্ছিস।

কী বুলছে?

বুলছে, কার গলা পাই হে।

নিশি, দুবলা নিশি তাড়াতাড়ি করে মাথায় পোঁটলা তুলে ছুটতে থাকল। মেয়ে দুটো বাপের পেছনে ছুটতে থাকল। যাবার সময় নিশি বলছিল, বুলেছি না অত হাস্য ভালো লয়।

ও সামুতে কে কথা বলে হে? জবাব লেই কেন হে।

অন্ধকারে মনে হল শশী দানবের মতো থপথপ করে খামারবাড়ি থেকে নেমে আসছে। আকালের ঘণ্টা ওর হাতে এখন বাঁধা নেই। অথবা মনে হল, কালো কুচকুচে এক ভুজঙ্গ পাখি ধরার জন্য নেমে আসছে। সে খুব জোরে হাঁকছিল না। কারণ ফাঁদের ভেতরে পাখি ধরা পড়েছে—ও যেন গলা শুনে আকালের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সব টের পাচ্ছিল। সুতরাং সে চোর চোর বলে জোরে পর্যন্ত চেঁচাল না।

চাঁদের আলোটুকু পর্যন্ত মরে গেছে। নিশুতি রাতের অন্ধকার তেমনি ভয়াবহ। বিলে সেই এক পাখি এখনও ডাকছে। আর গাদাজলের ভিতর সোনামণির পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে নিশির সঙ্গে ছুটে যেতে পারল না। নিশি ছোট্ট এক পুঁটলি মাথায় করে

দ্রুত চলে গেল। কিন্তু সোনামণির পুঁটলি ভারী, সে কিছুতেই বোঝাটা মাথায় তুলতে পারল না। দূরে নিশি ছুটছে। অঙ্গি বঙ্গি ছুটছে। সোনামণি মাথায় তুলে নেবার জন্য আরও দবার চেষ্টা করল। বার বার চেষ্টা করল। বার। বারই জলে কাদায় পড়ে যাচ্ছে সোনামণি, পা হড়কে যাচ্ছে, পা শক্ত করে কাদার ভিতর দাঁড়াতে পারছে না। পালাবার জন্য বোঝা নিয়ে সে টানাহ্যাঁচড়া করতে থাকল—টেনে টেনে বোঝাটা উঁইয়ের এক পাশে নিয়ে আসার চেষ্টা করল–পারল না। চোখ মুখ ক্রমশ শুকিয়ে আসছে ভয়ে। ক্রমশ সোনামণির হাত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। শশী এখন সেই দানবের মতো অথবা সেই এক আলিসান ভুজঙ্গ খাব খাব করছে। যেন বড়ো উল্লাস শশীর, আর হায় সোনামণি সামান্য এক প্রাণ, কাদার ভিতর পাখির মতো ধরা পড়ে গেল।

শশী রসিকতা করে যেন হাঁকল, সাহস তো বড়ো কম লয় হে! জবাব দিচ্ছ না ক্যানে!

সোনামণি বুঝল, এত বড়ো বোঝা ওর তুলে নেবার ক্ষমতা নেই। বুঝল, এত কষ্টের সংগ্রহ, প্রাণের চেয়েও মুল্যবান পুটলিটি ফেলে গেলেও রেহাই পাবে না। এখন ছুটতে গেলেও ধরা পড়ে যাবে।

শশী এখন হাত দশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সে আর এগুল না। সে বোধ হয় দাঁড়িয়ে পাখিটার তামাশা দেখছিল। কাদার ভিতর হুটোপুটি দেখছিল। শেষে দরাজ গলায় যেন পাখি আর পালাতে পারবে না, এমন এক দরাজ গলায় হাঁকল, কে উঁইয়ের ভিতর হুটোপুটি করছে হে।

অন্ধকারে সোনামণি কী করবে ভেবে পেল না। ভয়ে উত্তেজনায় অস্থির সোনামণি। তবু ছুটে একবার দেখতে পারে। এখনও সময় আছে। যখন আর উপায় নেই, শশীই ওর কাল-শশী...ওকে ধরে ফেললে দুবলা নিশিকে নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি হবে তখন মাঠের ভিতর দিয়ে ছোটাই ভালো। সে ওর সোনার ধান্য ফেলে ছুটতে থাকল।

কে আছ হে! দ্যাখ, দ্যাখ, চোর পালাচ্ছে। খামারে চোর পড়েছে। শশী এই বলে হাস্য ছড়াল। তারপর শশী চোর ধরার মতো অন্ধকারে সোনামণির পেছন পেছন ছুটতে থাকল। সোনামণি আপ্রাণ ছুটছে, অন্ধকারে ছুটছে। তার কাঁটার। বেড়া সামনে। বেড়াটার সামনে সোনামণি পথ পেল না পালাবার। শশী চোরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু সোনামণির গা পিছল, কাদাজলে গা পিছল। পাঁকাল মাছের মতো সোনামণি শশীর শক্ত বাহু থেকে হড়কে গেল। হড়কে গিয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য সোনামণি। সোনামণি অন্ধকারে ছুটছে, যেদিকে উঁই আছে সেদিকে ছুটছে। সেই অন্ধকারে মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দু-হাত উপরে তুলে জনহীন প্রান্তরে শশী চিৎকার করে উঠল, তুমি সোনামণি, তুমি জানো না আমি শশী, আমি কাল-শশী। তোমাকে আমি ফাঁদে ফেলেছি হে সোনামণি। ফাঁদের কথা শুনে সোনামণি আর ছুটতে পারল না। হাত-পা অসাড় হয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার, চারিদিকে তার কাঁটার বেড়া আর সেই আকালের ঘণ্টা কে যেন কেবল বাজিয়ে চলেছে। হা মা ঈশ্বরী আর ছুটতে লারছি। বলেই সে ভুইয়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। জমির পাড়ে দাঁড়িয়ে শশী হা হা করে সেই হাস্য ছড়াল। খাকি হাফ-প্যান্ট পরা শশী কাদার ভিতর নেমে গেল। উদোম গায়ে শশী সোনামণিকে সাপটে ধরল। কিন্তু

হড়কে যেতেই শুকনো জমি থেকে ধুলো মাটিতে হাত শুকনো করে এল। তারপর ফের কাদার ভিতর নেমে সোনামণিকে মরা মাছের পাখনা ধরে টানার মতো একটা হাত টেনে তুলল ওপরে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আমার ভুইয়ে খোলা গায়ে মুরগি ওড়ে, এ কী তাজ্জব হে! কিন্তু কোনো জবাব নেই। কাদার ভিতর মড়ার মতো পড়ে আছে সোনামণি। শশী শরীরের ভিতর হাত দিয়ে কীখুঁজল, শেষে হাঁটু গেড়ে পাশে দু-হাত রেখে কাদা থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, বড়ো পলকা শরীর সোনামণির। সে তাকে কাঁধে তুলে নিল। দূরের মজা দিঘিতে ধুয়ে পাকলে নেবার জন্য শশী হাঁটছিল। দু-পা যেতেই সোনামণি কাঁধ থেকে হড়কে নীচে পড়ে গেল। আর শশী শক্ত করে ধরতেই সোনামণি যেন প্রাণ পেয়ে গেল। সে আবার ছুটছে। শশীর শরীর ভারী, সে কাদার ভিতর ছুটতে পারছিল না। সোনামণির পলকা শরীর সে সামান্য আরামে প্রাণ পেয়ে গেল, সে উড়ে উড়ে পাখির মতো উঁইয়ে খেলা দেখাতে থাকল শশীকে। সে প্রায় উড়ে উড়ে ছুটতে থাকল। সে এই কাদার ভিতর শশীকে ঘুরিয়ে মারছে। সেই যেমন নিশি একদিন এক মাঠে এক ভুজঙ্গ নিয়ে ঘরে ঘরে খেলা করছিল, মাঠের ভিতর তেমনি সোনামণি এক ভুজঙ্গ নিয়ে কাদায় উঁইয়ে লড়ছে। কিন্তু হায়, এ খেলা বিষম খেলা। ভুজঙ্গ পাখি ধরার জন্য লড়ছে, পাখি প্রাণ বাঁচানোর জন্য লড়ছে। ফাঁদের ভেতরে পাখি। শুধু ছটফট করা যায়। সোনামণি খেলায় শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। কারণ পা হড়কে পড়ে গিয়ে সে কাদার ভিতর আটকে গেল। শশীরও তর সইছে না। সে হাঁটু মুড়ে কাদার ভিতর বসেই বলে উঠল, খোলা গায়ে মুরগি ওড়ে, গাস কত সুখ রে।

সোনামণি জবাব দিল না। মরা গোসাপের মতো চিত হয়ে পড়ে থাকল। কারণ এতটুকু শক্তি আর সোনামণির অবশিষ্ট ছিল না। সামান্য সেটুকু শক্তি সে শুধু বিলাপের জন্য, সে নীচে পড়ে শুধু বিলাপ করতে থাকল, হ্যাঁ রে নিশি, তুই আমারে ফাঁদে ফেলে চলে গ্যালি রে! হ্যাঁ রে নিশি, আমার সোনার ধান্য চুরি যায় রে!

শশী বলল, সোনার ধান্য আমার। সোনামণি বলল, সোনার ধান্য আমার। তু আমার সোনার ধান্য চুরি করে লিচ্ছিস। বলেই হক করে শশীর গলাটা কামড়ে ধরল। ভালোমানুষের ছা শশী মুরগির মতো, জবাই করা মুরগির মতো উঠে দাঁড়াল। দু-তিনটে বড়ো লাফ দিল কাদার ভূঁইয়ে, পাগলের মতো দু-হাত উপরে তুলে ঘুরে ঘুরে শেষে এক আলিসান ভুজঙ্গের মতো লুটিয়েপড়ল। সোনামণি, সামান্য এক প্রাণ-পাখি শশীর মতো দানবের, যে আকালের ঘণ্টা বাজাত, প্রাণ হরণ করে চলে গেল। তখন থেকে থেকে পাখির ডাকটাও কমে গেছে, থেকে থেকে শশীর হ্যারিকেনটা খামারে দপদপ করে জ্বলছিল, শুধু জ্বলছিল। তেপান্তরের পাখিটা শূন্যে তখন উড়ছিল, ঘুরছিল আর বুঝি বলছিল—আকালের ঘণ্টা কে বাজায় দেখ।